বিশ শতকের প্রথমার্ধের নির্বাচিত বাংলা উপন্যাস (১৯১৪-১৯৫০) : আস্তিকতা ও নাস্তিকতা বোধ

অনল পাল

সন্দর্ভে যে প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে তা হলো— আস্তিক-নাস্তিক পরস্পর বিবদমান দার্শনিক প্রস্থান দুটি বাংলা সাহিত্যকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে? বাংলা আখ্যানে— মূলত উপন্যাসে— সেই তর্ক কীভাবে উপস্থিত হয়েছে? চরিত্রায়ণ ও থিমের মাধ্যমে দিয়ে এই ভাবনা কীভাবে আখ্যানের ভিতরে সঞ্চারিত হয়েছে, সেটিও আমাদের অভিনিবেশের বিষয়। আর সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমের প্রভাব-ই বা কেমন?

প্রথম অধ্যায়— আস্তিক-নাস্তিক পরিচয় ও উনিশ শতকে বাঙালির দর্শনচর্চা

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অংশে আলোচিত হয়েছে কারা 'আস্তিক' এবং কারা 'নাস্তিক'। সেই সূত্রে আস্তিক-নাস্তিক শব্দ দুটির অর্থের বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা ও ক্রমবিবর্তন বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে 'আস্তিক'-'নাস্তিক' শব্দ দুটির সঙ্গে নৈতিকতা ও সুন্দরের প্রসঙ্গ কীভাবে যুক্ত হয়েছে তার পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অংশের শেষে ভারতীয় দর্শন প্রস্থানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের প্রধান বিষয় উনিশ শতকে বাঙালির ঈশ্বর, যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতা চর্চা। সামগ্রিক ভাবে বাঙালির দর্শনচর্চার রূপরেখা দেওয়া এই অংশের উদ্দেশ্য নয়। মূলত কয়েকটি বিতর্ক ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন মানুষ যাঁদের

ঈশ্বর, যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতা বিষয়ক চর্চা বাঙালি মানসে প্রভাব ফেলেছে সেগুলির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একথা স্বীকার্য উনিশ শতকে নাস্তিকতার চর্চা সেভাবে বিকাশ লাভ করেনি।

দ্বিতীয় অধ্যায়— *চতুরঙ্গ, শেষ প্রশ্ন* : আস্তিক নাস্তিক প্রসঙ্গ

২.১ *চতুরঙ্গ*: বিশ্বাস, সংশয়, আশ্রয়

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশের বিষয় রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) *চতুরঙ্গ* (১৯১৪-১৫ পত্রিকা, ১৯১৬ বই আকারে)। 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' বিতর্ক *চতুরঙ্গ*-এর পরিণতিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তা এই অংশের মুখ্য আলোচনার বিষয়। উনিশ শতকে নাস্তিকতা জ্ঞানচর্চার মধ্যে থাকলেও, সে অর্থে আখ্যানের বিষয় হয়ে ওঠেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময় পর্বে তা আখ্যানের বিষয় হয়ে ওঠার কী কোনো বিশেষ কারণ আছে? বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, রাজনৈতিক টানাপোড়েন কি আলাদা তাৎপর্য নিয়ে আসে? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ও *চতুরঙ্গ*-এর গড়ে ওঠা কি নিছক সমাপতন? নাকি দুটি ঘটনার মধ্যে কোনো সম্বন্ধ রয়েছে? সেই সূত্রে রবীন্দ্র-চৈতন্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অভিঘাত কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল সেদিকেও অভিনিবেশ দেওয়া হয়েছে। *চতুরঙ্গ* প্রসঙ্গে সমালোচকদের বিভিন্ন অভিমতগুলির সঙ্গে মিল ও অমিলের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। *চতুরঙ্গ* নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে, অনেক ক্ষেত্রে সেই আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে আস্তিক-নাস্তিক বিতর্ক। কেউ উপন্যাসটিকে পড়তে চেয়েছেন শচীশের দৃষ্টিকোণ থেকে। কারুর কাছে তা শ্রীবিলাসের 'স্বধর্ম লাভের' আখ্যান। আমরা মূলত দেখতে চেয়েছি নাস্তিকতা, ভক্তিবাদ, অজ্ঞেয়বাদ মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত কোথায় এসে পৌঁছালো *চতুরঙ্গ*। সে প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তগুলিকে বিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। বিচিত্র চরিত্রের ভীড়ে 'কলিকাতা'-কে চরিত্র হিসেবে পড়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

২.২ *শেষ প্রশ্ন*: তর্ক, প্রশ্ন, সংস্কার

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের আলোচ্য বিষয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) *শেষ প্রশ্ন* (১৯৩১)। *শেষ প্রশ্ন* জনপ্রিয় তো নয়, বরং সমালোচক ও একাংশের পাঠকের কাছে নিন্দিতও বটে। *শেষ প্রশ্ন* ও 'অতি আধুনিক' বাংলা সাহিত্য বিষয়ক বিতর্কের মধ্যেকার সম্পর্ক এই অংশে আলোচিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের বয়ানে *শেষ প্রশ্ন* 'অতি-আধুনিক' সাহিত্যিক নমুনা। সেই বিশেষ নমুনাটি পেশ করার জন্য কেন তিনি 'আস্তিক'-'নাস্তিক' প্রতর্কটিকে আধার করলেন? এবং কেন প্রয়োজন পড়লো আধুনিক এবং কৃচ্ছ্রসাধিকা একটি চরিত্রের? সেই বিষয়টিতেও অভিনিবেশ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়— 'অসংলগ্ন ভবিষ্যত': জগদীশ গুপ্তর কথন বিশ্ব

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) উপন্যাস। সুদীর্ঘ কাল ধরেই সমালোচকদের বিশ্লেষণে জগদীশ গুপ্তর আখ্যান নিয়তি বা অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত আখ্যান, রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর আখ্যান 'সত্য' বলে মনে হয়নি। জগদীশ গুপ্ত কি নিয়তি বা অদৃষ্টের কথাই তাঁর আখ্যানে তুলে ধরেছেন? 'সত্য' অর্থাৎ কিনা বাস্তবের চিহ্নবিহীন জগৎ নির্মাণ করেছেন জগদীশ গুপ্ত? নাকি বাস্তবতার-ই আরেকটি পরত উন্মুক্ত করেন পাঠকের দরবারে? প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত, মান্য রুচিকে এবং 'জানা' বিষয়ক সীমাবদ্ধতাকে কি প্রশ্ন করতে চান তিনি? এই প্রশ্নগুলিই এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। সেই প্রসঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, সাবেক মঙ্গলময় 'ঈশ্বর'-এর মৃত্যুর সঙ্গে

তাঁর কথন বিশ্বের সম্বন্ধ কী তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। সমালোচকদের বিচারে জগদীশ গুপ্ত নিয়তির কথাকার, তাঁর চরিত্রেরা অদৃষ্টের হাতের 'ক্রীড়নক'। নিয়তি কিংবা 'নামহীন হিংস্রতা' ওৎ পেতে বসে আছে অসহায় মানুষের সর্বনাশ করবে বলে। তথাকথিত 'মহৎ বৃত্তিগুলি' যার উপরে সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে সেগুলি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় জগদীশ গুপ্তের আখ্যানে। এক 'তামসী' দুনিয়ার কথক তিনি। একথাগুলি তাঁর আখ্যান সম্পর্কে প্রায় প্রতিষ্ঠিত। নিশ্চিতভাবে যুক্তি আছে এর পিছনে। আমরা ভিন্ন প্রস্তাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এই প্রসঙ্গে আমরা বুঝতে চেয়েছি কেন এতো 'তিক্ত' জগদীশ গুপ্ত? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে এই তামসী জগতের সম্পর্ককে পাশাপাশি পড়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়— 'তিন বন্দ্যোপাধ্যায়': আস্তিকতা ও নাস্তিকতা বোধ

৪.১ *পুতুলনাচের ইতিকথা*: নিয়তি, স্বাধীনতা, দায়িত্ববোধ

চতুর্থ অধ্যায়ে 'তিন বন্দ্যোপাধ্যায়' আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এই অধ্যায়ের প্রথম অংশের বিষয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬)। সমালোচকদের বিচারে *পুতুলনাচের ইতিকথার* চরিত্রেরা নিয়তি হাতের 'পুতুল'। ভিন্ন কারণে তাদের স্ব-ইচ্ছা, স্বাধীনতা আক্রান্ত হয়েছে অজ্ঞেয় শক্তির দ্বারা। যেটি পাঠক সমাজে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রকাশকের মন্তব্যের কারণ। আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি উপন্যাসের চরিত্রেরা মূলত শশী-ডাক্তার কি নিয়তির ক্রীড়নক মাত্র?

৪.২ *দেবযান* : মর্ত্যলাভের অফুরান আকাঙ্ক্ষা

দ্বিতীয় অংশে আলোচ্য বিষয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) *দেবযান* (১৯৪৪)। *দেবযান*-এর কাহিনি বিন্যাসের মধ্যে বস্তুজগতের অনুপস্থিতি ও স্বর্গলোকের উপস্থিতি চোখের পড়ার মতো। কেন্দ্রিয় দুই চরিত্রই মৃত এবং স্বর্গবাসী। যে প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে আখ্যানকারের দার্শনিক অভিজ্ঞানের সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক কেমন? এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে এরকম উপন্যাস রচনার কারণ কী? *দেবয়ান*কে কি অলীক, 'ভূতুড়ে' গপ্পো বলা যায়? সমকালের সঙ্গে উপন্যাস ও ঔপন্যাসিকের সম্পর্ক কেমন? এই বিষয়গুলি এই অংশে আলোচনা করার চেষ্টা হয়েছে।

৪.৩ *যোগভ্রষ্ট* : সত্তার অনন্ত জিজ্ঞাসা

তৃতীয় অংশের বিষয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) *যোগভ্রষ্ট* (১৯৬০)। উপন্যাসটি *উল্টোরথ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ আলে আর গ্রন্থাকারে ১৯৬০ সালে। আমাদের গবেষণা প্রকল্পের সীমার মধ্যে তা পড়ে না। পরবর্তীকালে প্রকাশিত হলেও আখ্যানের কাল বিচার করে এটিকে আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে রেখেছি। নাস্তিকতার সঙ্গে অনৈতিকতার সম্পর্ক কেমন? নাস্তিক শব্দটি অনৈতিকের সমার্থক? এই দৃষ্টিকোণ থেকে *যোগভ্রষ্ট* উপন্যাসটি পড়ার চেষ্টা করা হয়েছে। *যোগভ্রষ্ট* এক অর্থে, তারাশঙ্করের চিন্তা ও বিশ্বাসের ইতিবৃত্ত এবং বিশ্বাস ভঙ্গেরও। ভূমিকায় জানাচ্ছেন যে, নতুন শতাব্দী তাঁর চিন্তায়, সংস্কার-বিশ্বাসে আঘাত হেনেছে। যার ফলে সব কিছু ভেঙে ধুলিসাৎ হয়ে গেল। কোনো বিশ্বাস নেই, মঙ্গলের আশ্বাস নেই, চারদিকে শুধুই মরুভূমি। এমনকি ঈশ্বর বিশ্বাসও ভেঙে গেছে। জগৎ এখন নাস্তিময়, আর ঈশ্বর মৃত। সত্যি কি ঈশ্বর কখনো ছিলেন? এই চিন্তাও উদিত হয়েছে তাঁর মনে। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র সুদর্শন। যার চৈতন্যের সংকট ও আত্মজিজ্ঞাসা এই উপন্যাসের বিষয়।

পঞ্চম অধ্যায়— প্রসঙ্গ ‘বাস্তবতা’: অস্তি-নাস্তিবোধ

পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয় ‘বাস্তবতা’র সঙ্গে ‘অস্তি-নাস্তি’বোধের সম্বন্ধ কী রকমের? বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে ‘বাস্তবতা’ বিষয়ক বিতর্কের সূত্রপাত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। যদিও এখানে বাস্তবতা অপেক্ষা নৈতিকতাই প্রাধান্য পেয়েছে। বস্তুত, বিশ শতকেই এই বিতর্কের শুরুয়াৎ, যেটিকে মূলত দুটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। এক, প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ আক্রান্ত হন এই বলে যে তাঁর সাহিত্য ‘বস্তুতন্ত্রহীন’, তা যথেষ্ট বাস্তবোচিত নয় এবং বৃহত্তর জনজীবনের ছাপ তাঁর আখ্যান জগতে অনুপস্থিত। দুই, এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ-ই পরবর্তী প্রজন্মের সাহিত্যিকদের আক্রমণ করেন ‘বিলেতের আমদানী’ করা সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন আরোও অনেকানেক সমালোচকই আধুনিক সাহিত্যিকদের সমালোচনা করেছিলেন বিভিন্ন প্রশ্নে। ফলত এই পর্বের মধ্যে নানান স্তরায়ণ লক্ষ করা যায় এবং বিতর্কটি হয়ে ওঠে জটিল ও বহুমুখী। তাঁদের ‘বাস্তবতা’ ও ‘অতি-আধুনিক সাহিত্য’ ভাবনার সঙ্গে লগ্ন হয়ে থেকে অস্তি-নাস্তি সম্বন্ধীয় বোধ, মঙ্গল-অমঙ্গলের চেতনা। এই বিতর্কটিকে কীভাবে আস্তিক-নাস্তিক বিবাদমান প্রস্থান প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে সেটিই আমাদের মুখ্য আলোচনার বিষয়। আধুনিক সাহিত্যিকেরা বাস্তব জীবনের আকাঁড়া প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছিলেন সাহিত্যের মধ্যে। ফলে তাঁদের লেখার মধ্যে বাস্তব জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়। বিপরীতে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র অনুসারীরা ‘বাস্তবতা’ বিষয়ে বিকল্প আরেকটি বয়ান হাজির করেন। রবীন্দ্রনাথের অভিমত, ‘অহেতুক অনির্বচনীয়’ আনন্দের জগৎ সৃষ্টি করাই কবি/সাহিত্যিকের কাজ। বিজ্ঞান সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে সত্যকে উপস্থাপিত করে, বিপরীতে কবি/সাহিত্যিক অবিচ্ছিন্নভাবে সত্যকে উপলব্ধি করেন। অজিতকুমার

চক্রবর্তীর মতে, বাস্তবের অনুকৃতি কবি/সাহিত্যিকের কাজ নন, তিনি খণ্ড খণ্ড উপাদানকে জুড়ে এক গভীর বৃহৎ সত্যকে উপস্থিত করেন। বাস্তব ও 'কবির বাস্তব' এক নয়।

উপসংহার

সন্দর্ভটি যে নিশ্চিত করে একটি বিন্দুতে (Point) মিলিত হবে এমন নয়, বরং চিন্তার, তর্কের বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, টানাপোড়েন, বিভিন্ন পিছুটান আলোচিত হয়েছে। নির্বাচিত উপন্যাসগুলির বাইরে, আরও কয়েকজন লেখকের আখ্যানে 'আস্তিকতা' ও 'নাস্তিকতা' সম্বন্ধীয় বোধ কীভাবে প্রবাহিত হয়েছে সেই বিষয়টির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। শেষ কথা— প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিভূমিকেই কার্যত বদলে দেয়। যুদ্ধ মঙ্গলময় সাবেক ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তোলে, প্রশ্ন মুখে পড়ে ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্তির সৌজন্যে প্রাপ্ত যুক্তিবোধও। চৈতন্যের সংকট, মানবিক আকুতিকে ঐ সময়ের আখ্যানকাররা তুলে ধরেছেন তাঁদের আখ্যানে। তা করতে গিয়ে আস্তিকতা ও নাস্তিকতা বিষয় ভাবনাকে আখ্যানের কেন্দ্রিয় সমস্যা-পট (Problem) হিসেবে ব্যবহার করেছেন।